② (Kayla shilpa o sramik – ajker abastha)

সভাপতি (৩) রবীন্দ্রনাথ বোস (৪) সরোজ ব্যানার্জী
(৫) রমেশ ভট্টাচার্য

সাক্ষী :
(১) বি এন ব্যানার্জী (২) দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত

সংযোজনী—১

মেটাল বক্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড
কলকাতা

প্রিয় মহাশয়
কোম্পানি এবং মেটাল বক্স ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন মেটাল বক্স স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন ও মেটাল বক্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৩ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে আমি এতদ্বারা সম্মত হচ্ছি যে ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৩ তারিখের চুক্তির, আমি যার একটি পক্ষ, শর্তানুসারে আমি কলকাতা নং ১ কারখানার পর্যায়ক্রমিক পুনঃপ্রচলন মোতাবেক কাজে যোগ দিচ্ছি এবং কর্মস্থলের নিয়মকানুন সমেত সেটিকে মেনে চলতে আমার নিশ্চিতি দিচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত

তারিখ.................. নাম ....
টিকিট/কম নং..
ডিপার্টমেন্ট..
ইউনিট..

① 2002-03-
② Import duty 15% ... 5%
State Bank ... Proposal ...

R-2

কয়লা শিল্প ও শ্রমিক—আজকের অবস্থা

[পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্প নিয়ে এবছরই প্রথম এক সমীক্ষা চালিয়েছে 'নাগরিক মঞ্চ'। প্রয়োজনের থেকে অনেকটা কমই তথ্যানুসন্ধান বা সমীক্ষার কাজ করা গেছে। ফলে এই লেখায় শ্রমিকদের অবস্থা ও শিল্পটি সম্পর্কে শুধু প্রাথমিক পরিচয়ই দেওয়া যাবে মাত্র।]

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল—জাতীয়করণের আগে

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্ত্র ও গোলা-বারুদ তৈরির প্রয়োজনে, ১৭৭৪ সালে রাণীগঞ্জ অঞ্চল থেকে প্রথম কয়লা তোলা শুরু হয়। তখন মাটি কেটে একেবারে ওপরের স্তরের কয়লাটুকু তোলার কাজ হত। নদীপথে সেই কয়লা কলে নিয়ে যাওয়া হত কলকাতায়। গভীর কূপ খুঁড়ে তলার স্তর থেকে কয়লা তোলার কাজও শুরু হয় এই রাণীগঞ্জ অঞ্চলেই ১৮১৫ থেকে ১৮২০ সালে নাগাদ। স্টীম ইঞ্জিন ও রেল লাইন পাতা হবার পরই কয়লা শিল্প বাড়তে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নানান বিদেশী কোম্পানি ও দেশী মালিক কয়লা খনি চালাতে শুরু করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে।

সেই যুগে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে সবচেয়ে বড় ও নাম করা কোম্পানি ছিল ইক্যুইটেবল কোল কোম্পানি (ম্যাকনীল বেরী-র) ও বেঙ্গল কোল কোম্পানি (এ্যাণ্ড্রু ইয়ুল-এর)। এছাড়া ছিল লোদনা কোল কোম্পানী (টার্নার মরিসন), বার্ড' ও বীরভূম কোল কোম্পানি। পশ্চিম ভারতীয় মালিকদের মধ্যে নাম করা ছিলেন চনচনী, কেওড়া ও কারমানি-রা। বাঙালী মালিক কলতে এইচ কে নাগ, জে সি বসু, প্রমথ দত্ত রায় চৌধুরী ও লাভপুরের ষষ্ঠী ব্যানার্জি ইত্যাদিরা।

'৫৬ সালের এক হিসেব অনুযায়ী ইক্যুইটেবল ও বেঙ্গল কোল কোম্পানি

মিলিয়ে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারেরও বেশি। টার্নার মরিসন ও চেনচনী মিলিয়ে তখন ছিল প্রায় ১৩ হাজার শ্রমিক।

সেণ্ট্রাল ওয়েজ বোর্ড ফর কোল মাইনিং ইণ্ডাস্ট্রীজ-এর '৬৬ সালে প্রকাশিত এক দলিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনিগুলো থেকে কতটা করে কয়লা ওঠানো হয়েছে তার এক হিসেব দেওয়া হল :

বছর	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	বছর	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)
'৫৪	১০·৭৫	'৬০	১৬·৪৭
'৫৫	১১·৫২	'৬১	১৭·২৫
'৫৬	১১·৪৭	'৬২	১৮·৭৬
'৫৭	১৩·৮৮	'৬৩	১৯·৬৪
'৫৮	১৪·৪৭	'৬৪	১৯·১৪
'৫৯	১৫·২০	'৬৫	১৯·৯৮

'৬৫ সালে সারা ভারতে কয়লা উৎপাদন হয়েছিল ৬৭·১৭ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ '৬৫ সালে সারা ভারতের ৩৩·৬% কয়লা উৎপাদিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে।

৪০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন এমন এক শ্রমিকের মুখে শুনেছিলাম ষাটের দশকের গোড়ার দিককার ব্যক্তিমালিক বা গোষ্ঠীদের কয়লা খনিগুলোতে শ্রমিকের অবস্থা। "তখন স্থায়ী শ্রমিক অনেক কম ছিল। এ অঞ্চলে বসানো হত কুলী 'ক্যাম্প'। গোমস্তা বা সর্দাররা ইউ পি, বিহার, উড়িষ্যা ও এম পি-র গ্রামগুলো থেকে কাজের লোক জড়ো করে নিয়ে আসত। এই ক্যাম্পগুলোকে বলা হত 'ভোকেশনাল ট্রেনিং সেণ্টার।' কড়া পাহারায় এদের রাখা হত এই ক্যাম্পগুলোতে। এমনকি 'ময়দান' যাবার সময়েও থাকত পাহারাদার। ক্যাম্পগুলোতেই তাদের জন্যে রান্না করা হত লপসী। এদের খনির কাজ করানো হত একরকম জোর করেই। বেশির ভাগ সময় এদের আনা হত মধুপুর, কারমাটাড়, গয়া, বালিয়া, ছাপড়া, গোরখপুর আর ইউ পি বিহারের খরা প্রবণ অঞ্চল থেকে। জাতীয়করণের আগে পর্যন্ত খনি শ্রমিকদের ৯০ ভাগ ছিলেন ভিন-রাজ্যের, কিন্তু আজ তা ৬০ ভাগের বেশী নয়।"

জাতীয়করণ ও সি আই এল

পঞ্চাশের দশকে শিল্প স্থাপনে কয়লার গুরুত্ব বাড়তে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত গতিতে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের স্বার্থে ন্যাশনাল কোল ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) স্থাপন করে '৫৬ সালে। ভারতীয় রেলের স্টীম ইঞ্জিন চালানোর জন্যে যে এগারোটা খনি থেকে কয়লা তোলা হত, প্রাথমিকভাবে সেইগুলোই এন সি ডি সি-র আওতায় আনা হয়। এই কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল নতুন কয়লা খনি অঞ্চল চিহ্নিত করার আর বাকি জানা অঞ্চলগুলোতে নতুন খনি চালু করার।

সব দিক বিচার করে ১৬ অক্টোবর '৭১ ভারত সরকার সমস্ত কোকিং কোল খনি হাতে নিয়ে নেয় এবং পরে ১ মে '৭২ সেই সব খনি জাতীয়করণ হয়ে যায়। এই সমস্ত জাতীয়করণ করা খনিগুলোর পরিচালনভার দেওয়া হয় ভারত কোকিং কোল লিমিটেড বা বি সি সি এল নামের এক নতুন সরকারি সংস্থার ওপর।

জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্তের পেছনে তখন যে সমস্ত কারণ দেখানো হয় তা মোটামুটি এই রকম ঃ

* দ্রুত লাভ করার মানসিকতা থেকে যে ভাবে কয়লা তোলা হচ্ছিল তার ফলে অনেকটা প্রাকৃতিক সম্পদ-ই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল—এই ধরণের জাতীয় ক্ষতি বন্ধ করার প্রয়োজনে ;
* ভাণ্ডার থেকে পরিকল্পনা মাফিক কয়লা তোলার ব্যবস্থা করার জন্যে ;
* কয়লা তোলার সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তার ঠিকমতন ব্যবস্থা করতে ;
* কয়লার প্রয়োজন বাড়ার সাথে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যতে কয়লার যোগানে যথেষ্ট অর্থ লগ্নীর অবস্থা সৃষ্টি করতে ;
* কয়লা শ্রমিকের জীবন যাপনের মান উন্নত করতে।

এর কিছু পরেই ৩০ জানুয়ারি '৭৩ বাকি সমস্ত নন-কোকিং কোল খনি কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়ে ১ মে '৭৩ দেশের সমস্ত কয়লা খনি জাতীয়করণের কাজ শেষ করে।

যে খনিগুলো '৭৩-এ জাতীয়করণ হয়েছিল সেগুলো কোল মাইনস্ অথোরিটি লিমিটেড এর হেফাজৎ-এ ছিল পরের প্রায় তিন বছর। সরকারি মালিকানায় পরিচালনার সুবিধের জন্যে ওই কোম্পানির ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন ও সেণ্ট্রাল ডিভিশন তৈরি করা হয়।

১ নভেম্বর '৭৫-এ হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে তৈরি হয় কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (সি আই এল)। ওপরে উল্লেখ করা এন সি ডি সি, বি সি সি এল ও কোল মাইনস অথোরিটি লিমিটেড-এর আওতাভুক্ত সমস্ত খনি চলে আসে সি আই এল-এর আওতায়। ১০, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১-এ চালু হয় কোল ইণ্ডিয়ার রেজিস্টার্ড অফিস। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়—নিরাপত্তা, অপচয় ও মান-এর দিকে কড়া নজর রেখে, কম খরচে ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার সঙ্গে, পরিকল্পিতভাবে কয়লা উৎপাদনের কাজ দেখাশোনা করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে সি আই এল বা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

সি আই এল-এর মধ্যে যে সমস্ত সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আছে তাদের নাম ও হেড কোয়ার্টার নীচে দেওয়া হল ঃ

নাম	হেড কোয়ার্টার		খনির সংখ্যা
☐ ই সি এল (ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ)	সাকতোরিয়া	(পঃ বঃ)	১২৬
☐ বি সি সি এল (ভারত কোকিং কোল লিঃ)	ধানবাদ	(বিহার)	৯১
☐ সি সি এল (সেণ্ট্রাল কোলফিল্ডস্ লিঃ)	রাঁচি	(বিহার)	৫৪
☐ ডব্লিউ সি এল (ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ)	নাগপুর	(মহারাষ্ট্র)	৬৭
☐ এস ই সি এল (সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ)	বিলাসপুর	(মধ্য প্রদেশ)	৭৫
☐ এন সি এল (নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিঃ)	সিঙ্গরাউলি	(মধ্যপ্রদেশ)	১০
☐ এম সি এল (মহানদী কোলফিল্ডস্ লিঃ)	সম্বলপুর	(উড়িষ্যা)	২১
☐ সি এম পি ডি আই এল (কোল মাইনস প্ল্যানিং এ্যাণ্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট লিঃ)	রাঁচি	(বিহার)	—

ওপরে দেওয়া আটটা কোম্পানির মধ্যে কয়লা উৎপাদন করে সাতটা—সি এম পি ডি আই এল পরিকল্পনা, গবেষণা ও ডিজাইনের কাজ করে। আসামের নর্থ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ (মাংপেরিটা)-এর পাঁচটা খনি ও পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স সরাসরি কোল ইণ্ডিয়ার পরিচালনাধীন।

কোল ইণ্ডিয়া ও বাকি আটটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ছাড়াও কিছু খনি আছে যেগুলোর পরিচালনভার অন্যান্য সংস্থার হাতে রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কয়লা খনিগুলোর পরিচালনা করে সিঙ্গারেনী কোলিয়ারি কোং লিঃ। এছাড়া ইসকো, ডি ভি সি ও টিসকোর আওতায় কয়েকটা করে 'ক্যাপটিভ' কয়লা খনি রয়েছে।

সি আই এল—সংখ্যা ও তথ্যে

[] জাতীয়করণের সময় সারা দেশে মোট কয়লা উৎপাদন হত প্রায় ৭০ মিলিয়ন টন। '৭৫-'৭৬-এ উৎপাদন হয় ৮৮'১৮ মিলিয়ন টন, আর '৯২'-৯৩ সালে ২১১'১৯ মিলিয়ন টনের বেশী। এই একই সময় শ্রমিক সংখ্যা '৭৫-৭৬-এ ৬.০৫, ৯৭৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬,৬৩, ৫৪৯ (১৯৯৩ সালের এপ্রিল)। অর্থাৎ গত ১৮ বছরে উৎপাদন বেড়েছে ১৩৭% আর পাশাপাশি শ্রমিক সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০'৫%।

[] '৯৩ এর ১ জানুয়ারির জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হিসেব অনুযায়ী ভারতের ভান্ডারে মোট কয়লা আছে ১,৯৩,৭৭৭ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে ৩২'২১% বিহারে, ২৩'৮৪% উড়িষ্যায়, ২০'১৩% মধ্য-প্রদেশে, ১২.৯৫% পশ্চিমবঙ্গে, ৫'৫৮% অন্ধ্রপ্রদেশে, ৩'২২% মহারাষ্ট্রে, ০'৬৪% উত্তর প্রদেশে ও বাকি ০'৪৩% উত্তর-পূর্বাঞ্চলে।

[] কোল ইন্ডিয়ার আওতায় ৪৪৯টি খনি ও ১৫টি ওয়াশারিজ আছে। এসব থেকে উৎপাদিত হয় র' কোল (কোকিং ও নন-কোকিং), ওয়াশড কোল, মিডলিংস সফ্‌ট কোক ও হার্ড কোক, কোল টার, কোল গ্যাস, কোল কেমিক্যালস ইত্যাদি।

[] সারা দেশে শক্তি উৎপাদনের যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলো মোট উৎপাদিত শক্তির কতটা তার খতিয়ান নীচে দেওয়া হল ঃ

শক্তির উৎস	'৭০-৭১ (%)	'৯০-৯১ (%)
কয়লা	৭৮'৪২	৬৭'৮৮
খনিজ তেল	১৪'৬৬	২১'১৭
জলবিদ্যুৎ	৩'৩৪	২'৮২
লিগনাইট	১'৭১	২'১১
প্রাকৃতিক গ্যাস	১'৫৫	৫'৭৭
পারমাণবিক শক্তি	০'৩২	০'২৫

[] উৎপাদিত কয়লার প্রায় ৬০% যায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে; ২৫% মতো যায় ইস্পাত, রেল, সিমেন্ট ও সার কারখানাগুলোতে; ২০% মতো ব্যবহার করে ২০ হাজারেরও বেশি সুতো, কাগজ, রাসায়নিক

শিল্প, রিফ্র্যাক্টরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং প্ল্যান্ট, ফাউন্ড্রি ওয়ার্কশপ, ইটভাটা, চা ও তামাক বাগানগুলো ; ৭% ব্যবহৃত হয় রান্নার জ্বালানিসহ নানান ছোট বড় কাজে। এই কয়লার ৬২% রেল পথে ও ১৬% সড়ক পথে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

[] খনি থেকে কয়লা তোলা হয় দুভাবে—গভীরে থাকা কয়লা তোলা হয় 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড মাইনিং' পদ্ধতিতে আর অগভীর কয়লার স্তর থেকে কয়লা তোলা হয় 'ওপেন কাস্ট মাইনিং' পদ্ধতিতে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড মাইনিং-এ অনেক বেশি অর্থ, সময় ও শ্রমিক সংখ্যা লাগে।

এই দুই পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদনের চিত্র নীচে দেওয়া হল ঃ

	'৭৫-৭৬ মোট উৎপাদন (%)	'৯২-৯৩ মোট উৎপাদন (%)
ওপেন কাস্ট	২৬·৭১	৭৩·০৮
আণ্ডার গ্রাউণ্ড	৭৩·২৯	২৬·৯২

'৯৩-এর তথ্য অনুযায়ী সি আই এল-এর ৭০% শ্রমিক ২৬·৯২% কয়লা উৎপাদন করছেন আণ্ডার গ্রাউণ্ড মাইনিং পদ্ধতিতে, যেখানে ১৭% শ্রমিক ৭৩·০৮% কয়লা উৎপাদনে সামিল হচ্ছেন ওপেন কাস্ট পদ্ধতিতে।

[] সরকারি কোষাগারে কয়লা শিল্প থেকে (কোটি টাকায়) জমার পরিমাণ নীচে দেওয়া হল ঃ

সাল	রয়্যালটি	সেস	বিক্রয়কর	মোট
'৮০-'৮১	৩৭	২৪	৪৯	১১০
'৮৫-'৮৬	৬৮	৪১৯	১২৮	৬১৫
'৮৬-'৮৭	৬৮	৫২২	১৪০	৭৩০
'৮৭-'৮৮	৭৪	৬৪৯	১৭০	৮৯৩

[] মোট উৎপাদন ক্ষমতার কত শতাংশ প্রতি বছর উৎপাদন হচ্ছে (ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন) সেই হিসেবের দিকে তাকালেও বলা যায় যে কয়লা শিল্পের অবস্থা বেশ ভালই, অন্যান্য শিল্পের তুলনায়।

সাল	কয়লা (%)	ইস্পাত (%)	শক্তি (%)
'৮৬-৮৭	৮৬	১৭·২৫	৬০·৭৫
'৮৭-৮৮	৯০	২০	৭৯·৯
'৮৮-৮৯	৯২	১৫	৬৮

[] '৯৩-'৯৪ সালে কোল ইণ্ডিয়া সর্বকালের রেকর্ড লাভ করেছে, ৩৫১ কোটি টাকা, যা কিনা লক্ষ্য মাত্রার থেকেও ১০০ কোটি টাকা বেশি। পাশাপাশি '৬০ থেকে '৯০ এর এই তিরিশ বছরে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২·৯%।

[] প্রতিবছর সি আই এল-এর কতটা করে উৎপাদন বেড়েছে আর সেই বছরগুলোতেই শ্রমিক সংখ্যা কত কমেছে তা নীচে দেওয়া হল ঃ

	কত শতাংশ কয়লা উৎপাদন বেড়েছে	কত শতাংশ শ্রমিক সংখ্যা কমেছে
'৯১-৯২	৭·৬৪	০·৪৬
'৯২-৯৩	৩·৪৫	১·২২

[] সি আই এল-এ ধর্মঘট, আন্দোলন, শ্রমদিবস / উৎপাদন নষ্টের পরিমাণ ইত্যাদি নীচে দেওয়া হল ঃ

	'৮১-৮২	'৯১-৯২	'৯২-৯৩
ধর্মঘট	৩৮১	৫৬	৫৭
শ্রমদিবস নষ্ট	৫২৫৫৩১	৯৩১৩৫	১১৮,২১১
উৎপাদন নষ্ট (টনে)	৪৩৫০৫১	২০৩০৮৬	১৬৯,৫৬৯
আক্রমণের ঘটনা	১০২	৬৮	৩৫
বিক্ষোভ	১৮৯	১২৬	৭২
অনশন	৭৮	৫৫	৪৫

[] স্টীল অথোরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, বা সেইল, কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা হিসেবে স্টীল, অর্থাৎ ইস্পাতের বাজার দর ঠিক করে। কিন্তু কয়লার বাজার দর ঠিক করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার—কোল ইণ্ডিয়া (সি আই এল) নয়, যদিও এটাও একটা কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো একযোগে সি আই এল-কে এই অধিকার দেবার দাবী তুলছে সরকারের কাছে।

ই সি এল—সংখ্যা ও তথ্যে

* রাণীগঞ্জ ও মুগমা-সালানপুর কয়লা খনি অঞ্চলের আয়তন ১,৫৩০ বর্গ কিলোমিটার। এছাড়াও হুরাতে ৮০ ও সাহাজুরিতে ১০ যোগ দিলে ই সি এল-এর কয়লাখনি অঞ্চলের মোট আয়তন হয় ১,৬২০ বর্গ কিলোমিটার।
* ই সি এল-এর মাটির তলার ভাণ্ডারে এখনও কয়লা মজুত আছে ২০,৯১৪ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে রাণীগঞ্জে ১২,৭৫৮, মুগমা-সালানপুরে ৫,০৮৬, হুরাতে ২,৭৪৫ ও সাহাজুরিতে ৩২৫ মিলিয়ন টন। উল্লেখ করা যায় যে রাণীগঞ্জে মজুত কয়লার ১০,০০৩ মিলিয়ন টন খুবই উঁচু মানের নন-কোকিং কয়লা।
* রাণীগঞ্জের এই উঁচু মানের নন-কোকিং কয়লার বৈশিষ্ট্য হল—খুব সহজে পোড়ে, আগুনের শিখা লম্বা হয়, খুব বেশি তাপ সৃষ্টি করে, খুব তাড়াতাড়ি জ্বালানো যায়, জ্বলে গেলে সহজে নেভে না ইত্যাদি।
* সব শিল্পেই চাহিদা থাকলেও কাঁচ রিফ্র্যাক্টরী, সেরামিক ও ফোজিং শিল্প সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রাণীগঞ্জের কয়লার ওপর।
* মোট ১২৯টা কয়লা খনি আছে ই সি এল-এর আওতায় যার মধ্যে ১০টা ওপেন কাস্ট।
* আণ্ডার গ্রাউণ্ড খনি গুলোর মধ্যে ৬৯% খনি ১৬০ মিটার গভীর, ১১% ১৬০ থেকে ২৬০ মিটার গভীর ও বাকি ২০% ২৬০ মিটারের বেশি গভীর।
* খনির মধ্যে আগুন লেগে আছে এমন অঞ্চলের আয়তন ৬·০৬ বর্গ কিলোমিটার।
* কিছুটা অংশে জল জমে আছে এমন আণ্ডার গ্রাউণ্ড খনির সংখ্যা ১১২।
* মাটির ওপর রাস্তা, বাড়ি এসব কিছু থাকার ফলে মাটির তলায় যতটা কয়লা তোলা যাচ্ছে না তার পরিমাণ ৫,১০০ মিলিয়ন টন অর্থাৎ এই অঞ্চলে মোট মজুত কয়লার ২৫%। যেমন রাণীগঞ্জসহ নানান গ্রামের তলায় আছে ৩,১৬৭, রাস্তা ৫৫৬, রেল লাইন ৫৪৬, তেলের পাইপ

লাইন ১০৬, রোপওয়ে ৪৯ ও নদী-নালার তলায় আছে ৬৭৬ মিলিয়ন টন কয়লা।

* রাণীগঞ্জের কিছুটা অংশসহ ৪৯টা জায়গাকে বসতির পক্ষে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে সি আই এল নিযুক্ত এক বিশেষজ্ঞ কমিটি।

* '৬১ থেকে '৭১-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২৮·৪১% বাড়লেও রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে তা বেড়েছে ৫৮·৯৮% হারে। পরের দশ বছরে (·'৭১-৮১) ওই হার যথাক্রমে ৩১·৬১% ও ৫৯·৮৩%।

* কাজের সুবিধের জন্যে ই সি এল-এর ১২৯টা খনিকে ১৩টা অঞ্চল বা এরিয়াতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হল: নিরসা, সোদপুর, সীতারামপুর, কাজোরা, কেন্দা, শ্রীপুর, কুনুস্তোরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, বাংকোলা, ঝাঁঝরা, কাপাসারা, সালানপুর, ও সাতগ্রাম।

* জাতীয়করণের আগে-পরে মিলিয়ে প্রায় ৬০টা খনি বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে মজুত কয়লার ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাওয়া বা কয়লা থাকলেও তা তোলার খরচ অস্বাভাবিক বেশি হওয়া বা অন্যান্য ভূ-তাত্ত্বিক/কারিগরী বাধা।

* কয়লা তোলা হচ্ছে এমন সবচাইতে পুরোনো কিন্তু এখনও চালু কোলিয়ারীর তালিকায় আছে এই খনিগুলো: দিনাকুড়ি ও পারবেলিয়া যা প্রায় ২০০০ ফুট গভীর; মিঠানী ও বাংকোলা যেখানে চারটে আলাদা তলায় খনির কাজ হয়েছে বা হচ্ছে।

* ১২৯টার মধ্যে কাজের পরিবেশ সবচাইতে খারাপ যে খনিগুলো তাতে মধ্যে আছে লচিপুর (কাজোরা); শংকরপুর (বাংকোলা); দারুলা (পাণ্ডবেশ্বর); জামবাত (কেন্দা); নিযা (সোদপুর); শ্রীপুর ও রানা (শ্রীপুর); জামুরিয়া ও রতিবাটি।

* কাজের পরিবেশ বিচার করলে তুলনামূলকভাবে ভাল কোলিয়ারী: ঝাঁঝরা ১ ও ২; বিশ্বেশ্বরী, খাণ্ডোয়া ও নিয়রা (বাংকোলা); মধুসূদনপুর (কাজোরা); রামনগর ও খোটাডি (পাণ্ডবেশ্বর); কেন্দা; সোদপুর ও গোপীনাথ (নিরসা)। এদের কয়েকটার ক্ষেত্রে ই সি এল 'মডেল' শব্দটি ব্যবহার করে।

* কয়েকটা খনিতে বিদেশের কারিগরী সাহায্য ও কয়েকটাতে অর্থ সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সাহায্য করছে সোনপুর বাজারীর ওপেন কাস্ট প্রজেক্টে; ফ্রান্স কারিগরী সহযোগিতা করছে খোট্টাডিতে; কানাডা করছে রাজমহল ওপেন কাস্ট প্রজেক্টে; জার্মানী করবে বলে ঠিক হয়েছে চিনাকুড়ি খনিতে; রুশ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে ঝাঝরা খনিতে।

ই সি এল সম্পর্কে সাধারণ কয়েকটা তথ্য দেওয়ার পর নীচে দেওয়া হল কিছু বিশেষ ধরণের তথ্য যার থেকে একটা ছবি পাওয়া যাবে উৎপাদন, উৎপাদনে লাভ-ক্ষতি, শ্রমিক-কর্মচারি সংখ্যা, মজুরী ইত্যাদি সম্পর্কে।

[] '৭৫-৭৬ থেকে '৯২-৯৩ পর্যন্ত ই সি এল-এ পুঁজি লগ্নী করা হয়েছে ২,৭৮৪·৬ কোটি টাকা।

কোম্পানি ওই একই সময়ে লোকসান করেছে ২,৬৬০·২৪ কোটি টাকা।

[] শুধু '৯২-৯৩তে প্রফিট এ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী লোকসানের পরিমাণ ৩৪৬·৬৪ কোটি টাকা।

[] '৯২-৯৩-তে টন পিছু কয়লার উৎপাদন খরচ ৫৯৬·৮১ টাকা যেখানে বাজারে বিক্রির দর ৪৫৬·৮৮ টাকা প্রতি টন, অর্থাৎ টন পিছু ভরতুকি ১৩৯·৯৩ টাকা।

[] ১২৯টা খনির মধ্যে ৯০টা খনিতেই প্রতি টন কয়লা পিছু ১০০ টাকা বা তার বেশী লোকসান হচ্ছে।

[] টন পিছু ৫৯৬·৮১ টাকা উৎপাদন খরচের মধ্যে ৫২% যায় মজুরী ও মাইনে বাবদ। শুধু আণ্ডারগ্রাউণ্ড খনিতে মোট উৎপাদন খরচের ৬২% যায় এই বাবদ।

মোট উৎপাদন (মিলিয়ন টনে)

	'৭৫-৭৬	'৯২-৯৩	তুলনা
কোল ইণ্ডিয়া	৮৮·৯৮	২১১·১৯	১৩৭% বেড়েছে
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ	২৬·১৮	২৪·০৪	৮·১৭% কমেছে

সারণী থেকে হিসেব করলে দেখা যাবে যে আগে যেখানে ই সি এল-এর উৎপাদন সারা দেশের মোট উৎপাদনের ২৯·৪% ছিল এখন তা ৮·৮% এরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে।

[] মোট উৎপাদনের মাত্র ৮·৮% ই সি এল-এ হলেও এখানকার কর্মীসংখ্যা কোল ইণ্ডিয়ার মোট কর্মী সংখ্যার ২৬% এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারও কোল ইণ্ডিয়ার ১৮%-এর বেশী।

[] পিস্ রেটেড শ্রমিকদের অনুপস্থিতির হার গড়ে ৪৩·৫% আর অন্য দিকে টাইম রেটেড শ্রমিকদের অনুপস্থিতির হার গড়ে ২৯·৫৮%।

[] '৭৫-৭৬ সালে ই সি এল-এ মোট কর্মী ও শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১,৮৫,০৬১। এই সংখ্যা ৬% কমে '৯২-৯৩তে দাঁড়িয়েছে ১,৭৩,৫৫০।

[] '৯২-৯৩ সালে মোট কর্মকর্তার সংখ্যা ৩,৫৬৫, ক্যাজুয়াল কর্মী ১৮৫, বদলি শ্রমিক ২২৯, ট্রেনিং নিচ্ছেন ৮০১ ও বাকি শ্রমিক ১,৬৮,৭৭০ জন।

[] ১,৬৮,৭৭০ জন পার্মানেণ্ট শ্রমিকের মধ্যে ২৭,৯২৬ জন মান্থলি-রেটেড, ৮৪,৬৩২ জন ডেইলী রেটেড ও ৫৬,২১২ জন পিস্ রেটেড শ্রমিক।

[] ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিঃ-এ '৯২-৯৩তে মহিলা কর্মীর সংখ্যা মোট ১২,৩২২ অর্থাৎ মোট কর্মী সংখ্যার ৭·১%।

[] ১,৪২,৪৯৭ জন অর্থাৎ মোট কর্মীসংখ্যার ৮২% কাজ করেন আণ্ডার গ্রাউণ্ড খনিগুলোতে ; ১০·৫% অর্থাৎ ১৮,১৫৩ জন কাজ করেন ওপেন কাস্ট মাইনগুলোতে ও বাকি ৭·৫% কাজ করেন খনি অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য জায়গায়।

[] এপ্রিল '৯০ থেকে মার্চ '৯৩—এই তিন বছরে অক্ষম বা আনফিট হবার ফলে ১২,২৪৮ জন শ্রমিকের জায়গায় কাজ পেয়েছেন তাদের পরিবারের অন্য লোক। অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছরে ২·৩৩% শ্রমিক অক্ষম হয়ে পড়েছেন।

[] বিভিন্ন কারণে জমি নিয়ে নেওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে '৯০ থেকে '৯৩-এর মধ্যে ৪৯১ জনকে নতুনভাবে কাজ দেওয়া হয়েছে ই সি এল-এ। নিয়ম অনুযায়ী দু একর জমি অধিগ্রহণ করলে ১ জনকে চাকরি দেওয়া হয়।

[] যদিও ই সি এল-এর আণ্ডারগ্রাউণ্ড খনিতে ৮২% শ্রমিক কাজ করেন তবুও দেখা যাচ্ছে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে মোট উৎপাদন গত ১৭ বছরে কমেছে প্রায় ৩৭%।

	'৭৫-৭৬	'৯২-৯৩
আণ্ডার গ্রাউণ্ড	২৩·৫৬	১৪ ৮৯
ওপেন কাস্ট	২·৬২	৯·১৫
মোট	২·১৮	২৪·০৪

[] '৭৪ থেকে '৯০-এর মধ্যে কি হারে ন্যূনতম মজুরী বেড়েছে তা নীচে দেওয়া হল ঃ

তারিখ	টাইম রেটেড (প্রতিদিন)	ন্যূনতম মজুরী টাকায় পিস রেটেড (প্রতি মাস)
৩১·১২·৭৪	১২·২৮	৩২৬·৪৩
০১.০১·৮৩	৩১·২৮	৮২৩ ৫৯
০১ ০১·৮৭	৫০·১৮	১,৩১৪·৬৮
৩০.১১ ৯০	৬৫·০৯	১ ৭২৩·৮৮

[] ই সি এল বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদির জন্যে কয়লা পাঠায়। সেই বাবদ ই সি এল-এর এদের কাছে প্রাপ্য বকেয়া প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা।

[] ই সি এল-এ '৭৫-৭৬ থেকে ক্ষতির এক খতিয়ান দেওয়া হল ঃ

সাল	বাৎসরিক ক্ষতি (কোটি টাকায়)	'৭৫-৭৬ থেকে মোট ক্ষতি	মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)
'৭৫-'৭৬	২৫·৫২	২৫·৫২	২৩৫
'৮১-৮২	৯২·১৫	৪৭৫·০৬	২৪৩
'৯১-৯২	৩২৬·৩৯	২৩১৩·৬০	২৪৫
'৯২-'৯৩	৩৪৬·৬৪	২৬৬০·২৪	২৪০

[] '৯১ সালে ই সি এল-এ বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৩০ মেগাওয়াট মতো আর সে বছর বিদ্যুৎ পাওয়া গিয়েছিল চাহিদার ৬৯%। ৯২ সালে

চাহিদা দাঁড়িয়েছিল ১২০ মেগাওয়াট আর বিদ্যুৎ পাওয়া গিয়েছিল ৭৯% মত। সরবরাহ ব্যবস্থায় ট্রিপ করার সংখ্যাও '৯২-তে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় '৯১-এর তুলনায়।

[] ই সি এল-এ প্রতি শিফটে জন-প্রতি কয়লা উৎপাদন ক্ষমতা '৮৮-৮৯ সালে ছিল ১.১৭ টন যা '৯০-৯১তে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১.৩১-এ। পোলান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই ক্ষমতা প্রায় ৩ টনের কাছাকাছি।

খনি মজদুর—মজুরী

"হিসেব করলে তো অনেক টাকাই পাবার কথা—কিন্তু আমার মনে হয় গত কুড়ি বছরে বেশীর ভাগ মজদুরদের অবস্থা খারাপই হয়েছে। টেনেটুনে যা হোক করে চলছে" বললেন এক বয়স্ক শ্রমিক যিনি চল্লিশ বছরের বেশী খাদানে কাজ করছেন।

খনি মজদুরদের মজুরী ঠিক হয় কয়লা শিল্পের এক যৌথ দ্বিপাক্ষিক কমিটির (জয়েন্ট বাইপার্টাইট কমিটি ফর কোল ইন্ডাস্ট্রী) জাতীয় স্তরে মজুরী চুক্তির মাধ্যমে (ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট)। এই চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছে '৭৪, '৭৯ '৮৩ ও '৮৯ সালে। চতুর্থ মজুরী চুক্তির সময়কাল জুলাই '৯১-এ শেষ হয়ে গেলেও গত তিন বছরে পঞ্চম চুক্তি হয়নি।

চতুর্থ মজুরী চুক্তির পরে দেখা গিয়েছিল যে ১.১.৮০তে সব থেকে কম মজুরী পাওয়া শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী হবে দিনে ৫০.১৮ টাকা বা মাসে ১৩০৪৫০ টাকা। ডি এ বাড়ার ফলে ৩০.১১.৯০-তে এই মজুরী ছিল দিনে ৬৫.৯০ টাকা বা মাসে ১৭২৩৮৪ টাকা।

ন্যূনতম মজুরী ছাড়াও বেশ কিছু অতিরিক্ত পাওনা শ্রমিকরা পান, যেমন ঃ

- মাটির নীচে কয়লাখনিতে কাজ করার জন্যে আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যালাউয়েন্স—বেসিকের ২০% বা দিনে ৭.৬৯ টাকা।
- কাপড় জামা ধোয়ার জন্যে ওয়াশিং অ্যালাউয়েন্স—২২.৫০ টাকা প্রতি মাসে।
- যাতায়াতের জন্য ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস—কাজে এলে প্রতিদিন ২.৩০ টাকা।

- ☐ রাতের শিফটে যাতায়াতের জন্য এ্যাডিশনাল ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি— প্রতিদিন ৩·৫০ টাকা।
- ☐ খনিতে কয়লা কম থাকলে থিন সীম আলাউয়েন্স বেসিকের ২ থেকে ৫%
- ☐ মাটির তলার খনিতে জল থাকলে বর্ষাতি, গামবুট ইত্যাদি।
- ☐ সুড়ঙ্গ পথ খুব খাড়া হলে ৭৫ পয়সা প্রতি শিফটে এবং এই অবস্থায় ২ কিমি এর বেশী হাঁটতে হলে ১·৫০ টাকা প্রতি শিফটে।
- ☐ সিটি কমপেনসেটরী এ্যালাউন্সেস (সি সি এ)।
- ☐ বাড়ি ভাড়া বাবদ হাউসরেন্ট এ্যালাউন্সেস (এইচ আর এ) ইত্যাদি।

"আসলে কী জানেন তো, যে অবস্থায় আমাদের কাজ করতে হয় তাতে অসুখ লেগেই থাকে। ফলে একদিকে কামাই হয় বলে টাকা কাটা যায়, অন্যদিকে ডাক্তার, ওষুধের খরচা অনেক পড়ে যায়। তাছাড়া বাজার দর এমন চড়া যে কয়েক হাজার টাকা পেলেও হাতে রাখা খুব মুশকিল", বললেন কাজোরা অঞ্চলের এক স্থানীয় খনিশ্রমিক। কথা বলে আরো জানা গেল যে অনেক শ্রমিকই মাসে হাজার তিনেক টাকারও বেশী রোজগার করতে পারেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে বেশীর ভাগ শ্রমিকেরই টাকার টানাটানি।

খনি মজদুর—কিভাবে বেঁচে থাকেন

প্রাথমিক সমীক্ষা চালাতে গিয়ে এটা খুব পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এসেছে যে টাকা পয়সার অংশটাই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ই সি এল কর্তৃপক্ষ মানছে। অন্যান্য দিকগুলো যেমন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ঘরবাড়ি, শিক্ষা, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থাগুলো ভয়ানক রকম অবহেলিত।

বাসস্থান

ই সি এল-এর তথ্য অনুযায়ী জাতীয়করণের সময় ২৪·৮১% শ্রমিক খনি মালিকদের তৈরি করে দেওয়া বাসস্থান বা কোয়ার্টারে থাকতেন। ৩০.১১.৯৩ এর হিসেব অনুযায়ী ৫৭·৮৩% শ্রমিককে বাসস্থান দিচ্ছে ই সি এল। মোট ১,০০,০১৫টা বাড়ির মধ্যে ৫৯,৭৫০টা নির্ধারিত মান অনুযায়ী তৈরি। পরিকল্পনা অনুযায়ী '৯৩-৯৪ সালে নতুন ১,১০০টা এই ধরণের বাড়ি তৈরি করবে ই সি এল।

প্রথমতঃ এটা পরিষ্কার যে সব শ্রমিককে বাসস্থান দেবার পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতেও ই সি এল-এর নেই। অন্যদিকে জাতীয়করণের সময় যে ৩৭,৮৩৬টা বাড়ি ছিল তার মধ্যে বেশীর ভাগেরই খুব খারাপ দশা। সেগুলোর মেরামতির কাজে ই সি এল-এর উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

পাশাপাশি যে ঘরগুলো গত আট-দশ বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছে তার হাল চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না—খুবই নিম্নমানের এই বাড়িগুলোর এখনই মেরামতি করার প্রয়োজন। ই সি এল-এর ভাষায় 'নির্ধারিত মানের' নয়, এমন ৪০,২৬৫টা 'বাড়ি' আসলে নেহাতই ঝুপড়ি—প্রায় নড়বড়ে চার-দেওয়ালের ওপর খাপড়া বা টিনের চাল খাতায় কলমে হিসেবের তুলনায় আসল চিত্র অনেক খারাপ।

"বেশীর ভাগ সময় ঘরের মেরামত শ্রমিকরা নিজেরাই করে নেন—কোম্পানির কোয়ার্টার। অথচ নতুন কোনো এজেন্ট খনিতে ট্রান্সফার হয়ে এলে, এজেন্টের বাংলোর পেছনে দু-এক লাখ প্রতিবছরেই খরচ করতে দেখছি। এই ভাবেই ই সি এল আমাদের শ্রমিকদের সেবা করছে! শুনুন, ওইসব হিসেব অঙ্ক রেখে দিন—মোট কথা হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় ঘর কম, আর যারা পাচ্ছে তারা বাধ্য হয়ে থাকছে অনেক অসুবিধে করেও। কোয়ার্টার দিলে, গ্রামে বিবি-বাচ্চা ফেলে রেখে আমরা এই দূরদেশে একা পড়ে থাকি"? বলছেন এক মাঝবয়সী অবাঙ্গালী খনি শ্রমিক।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

"অনেক কোলিয়ারীতেই ডিসপেনসারী নেই। যতগুলো ডিসপেনসারী আছে তার অনেকগুলোতেই আবার ডাক্তার নেই। আর ডাক্তার মানে তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেসক্রিপশন বা সার্টিফিকেট—ওষুধ কই? হাসপাতালে ভর্তি থাকলে তাও কিছুটা ওষুধ পাওয়া যায়—আউটডোর বা ডিসপেনসারীতে দেখাতে যাওয়া মানে বাজার থেকে ওষুধ কেনা, টাকার রসিদ জমা দেওয়া, কত ঝামেলা!"—এক কথায় এই চিত্র বেশীর ভাগ জায়গাতেই।

খাতায় কলমে '৭৩ সালের ২৩টা ডিসপেনসারী বেড়ে '৯৩-এর নভেম্বরে হয়েছে ৯০, আর ৬৪১টা হাসপাতাল বেড বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২টা হাসপাতালে মোট ১,১৭৩। আর মাত্র ২৬৮ বেড বাড়লেই চুক্তি মতন প্রতি ২২০ জন শ্রমিকের জন্যে ১টা করে হাসপাতাল বেড হয়ে যাবে।

"বেশীর ভাগ সময়ই আমরা প্রাইভেট ডাক্তার দেখিয়ে নিই…"। এদিকে ই সি এল-এ ডাক্তার আছেন ৩৪১ জন, মানে প্রতি ৫০০ জন শ্রমিক পিছু একজন করে। খাতায় কলমে ১৪৭টা অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও তার বেশীর ভাগই খারাপ থাকে বা প্রয়োজনে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ অনেকেরই। "…যা ব্যবস্থা আছে ই সি এল-এ তা যদি ঠিক মতো চলত তাহলে কথা ছিলনা—কোটি কোটি টাকা কোম্পানি খরচ করছে কিন্তু শ্রমিকদের তা কোনো কাজেই আসছে না"। —এই হল চিকিৎসা ব্যবস্থার খন্ডচিত্র।

ক্যান্টিন

"আগে কম পয়সায় শ্রমিকরা পেট ভরে খেত এই ক্যান্টিনগুলোতে —এখন যান, দেখবেন বেশীরভাগ ক্যান্টিনে চপ আর চা। কয়েকটা কোলিয়ারীতে দেখবেন বোর্ড ঝোলানো আছে কিন্তু ঘর বন্ধই থাকে। কর্তৃপক্ষের এসব দিকে নজরই নেই—সব লোক দেখানো আর টাকা খরচ দেখানোর ফন্দী।"

হিসেব অনুযায়ী জাতীয়করণের সময়কার ৪৭টা ক্যান্টিন বেড়ে আজ দাঁড়িয়েছে ১১৪! ই সি এল-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী আর ২০টা খুলতে পারলেই এ ব্যপারে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে!

ইস্কুল

ই সি এল খুব স্পষ্ট লিখেছে যে শিক্ষার ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের দেখার কথা—কিন্তু তবু জাতীয়করণের পর থেকে ই সি এল ৮৩টা প্রাইমারী ইস্কুলের জন্যে বাড়ি করে দিয়েছে। তাছাড়া তারা ১টা জুনিয়র হাই ও দুটো হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলেরও বাড়ি করে দিয়েছে। কেমন চলছে এগুলো জানার চেষ্টা করতে উত্তর এলো—"খুব খারাপ। এগুলোর বেশীর ভাগেরই সরকারি অনুমোদন নেই. ফলে কয়েকটাতে কোনো শিক্ষকই নেই আর কয়েকটাতে দু একজন শিক্ষক ই সি এল-এর কাছ থেকে ৬০০/৭০০ টাকা নিয়ে যা হোক করে কাজ চালায়। স্কুল বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে—এই তো অবস্থা। তবে হ্যাঁ, আজকাল এই অঞ্চলে রমরমা ব্যবসা করছে প্রাইভেট, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি গজিয়ে উঠছে। যাদের পয়সা আছে তারা ছেলেমেয়েদের ওখানে পাঠাচ্ছে—বেশীর ভাগ শ্রমিকরাই তো আর ওসব করতে পারেনা।"

অবসর বিনোদন

২০ বছরে ১৬টা শ্রমিক ইনস্টিটিউট, ৩৭টা কম্যুনিটি সেন্টার ও ক্লাব, ৫টা স্টেডিয়াম—সবই নাকি শ্রমিকদের কথা ভেবেই! এক শ্রমিক নেতা বুঝিয়ে বললেন—"এসব কেন তৈরি হচ্ছে বুঝতে গেলে আপনাদের জানতে হবে যে আজকে ই সি এল হচ্ছে ঠিকেদার ও সাপ্লায়ারদের রাজত্ব। প্রয়োজন থাকুক না থাকুক সব সময় কিছু তৈরি হচ্ছে এই অঞ্চলে—যা আছে তার ২৫% ঠিক মতন কাজে লাগছে বা চলছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে জলের মতো—মুখে বলছে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজ। ই সি এল-এর ক্ষতি হবে না তো কি লাভ হবে?"

বিশুদ্ধ জল

জল শোধন করার ৪টে প্ল্যান্ট আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০১। ই সি এল-এর হিসেব অনুযায়ী এই অঞ্চলের ৫,৮৮,০২০ জন মানুষের ৮৫·৫%-কে বিশুদ্ধ জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এ ছাড়া এই অঞ্চলে ২৮৯টা চাপাকল ও ১১৪৩টা কুয়ো আছে।

অক্ষমতার কারণে চাকরি

নিয়ম অনুযায়ী কোনো শ্রমিক অক্ষম হয়ে পড়লে তার পরিবর্তে সেই পরিবারেরই অন্য একজনকে চাকরি দেবে ই সি এল। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ক্যান্সার, হৃদরোগ, কুষ্ঠ, অন্ধত্ব বা হাঁপানি (এ্যাজমা) হলে তবেই অক্ষম বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। তাছাড়া অক্ষম ঘোষিত তাদেরই করা হবে যারা এইসব অসুখের কোনো একটার কারণে অন্ততঃ ছ মাস মাইনে পাননি। '৯০ সাল নাগাদ যারা অক্ষম ঘোষিত হবার জন্যে আবেদন করেছিলেন তাদের ৬০% ঘোষিত হয়েওছিলেন। নতুন নিয়ম ও কড়াকড়ির ফলে '৯৩-৯৪তে মাত্র ১৫% আবেদনকারী অক্ষম ঘোষিত হয়েছেন।

আলোচনা

সকলেই এই একটা ব্যাপারে একমত। যতটা টাকা খরচ করা হচ্ছে খাতা কলমের হিসেব অনুযায়ী, তা যদি ঠিক মতন, পরিকল্পনা মাফিক খরচ হত তাহলে সত্যি কয়লা খনির শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল হত। মজুরী বোর্ডের ওপর ভালো হওয়া সত্ত্বেও বাকি ব্যবস্থা এতোই খারাপ যে অনাবশ্যকভাবেই

শ্রমিকদের বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে এমন অনেক জায়গাতেই যা তাদের বিনা-পয়সাতেই প্রাপ্য। ফলে ভাল মজুরী পাওয়ার বিশেষ কোন সুফল (ঘরে ঘরে টি ভি এ্যান্টেনা ছাড়া) চোখে তো পড়লই না বরং অনেক পিছিয়ে থাকা শিল্পের মার খাওয়া শ্রমিকদের কুলী লাইনের চির পরিচিত ছবি এ অঞ্চলেও চোখে পড়ল।

খনি মজদুর—কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা

দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়

কথায় বলে, খনিতে কাজ করা হল যুদ্ধ করার পরেই সবচাইতে মারাত্মক পেশা—এখানে পদে পদে বিপদের ভয়। আবার এও বলে যে দুর্ঘটনা ঘটেনা, ঘটানো হয়—অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা নিলে অনেক দুর্ঘটনাই এড়ানো সম্ভব। পাশাপাশি এটাও বলা হয়ে থাকে যে যতগুলো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ের কথা জানা যায় তার আট দশ গুণ বেশি দুর্ঘটনা ঘটার মতন অবস্থা আসলে কর্মক্ষেত্রে ওই একই সময়কালে সৃষ্টি হয়—শুধু দুর্ঘটনা ঘটে না এই যা।

পশ্চিমবঙ্গের কয়লা খনি শ্রমিক তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কতটা আক্রান্ত ও সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কতটা সচেতন উদ্যোগ নিচ্ছে তা বোঝারও চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রাথমিক সমীক্ষাতে। যদিও নানান অসুবিধের জন্যে সরেজমিনে খুব বেশী ঘোরা হয়নি তবু শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেছে তা বলার চেষ্টা হল।

খনি দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যুর প্রায় ৩৫% ঘটে খনির ছাদ বা দেওয়াল থেকে হঠাৎ কয়লা ভেঙে পড়ে। এগুলোকে বলে 'রুফ ফল' বা 'সাইড ফল'। এছাড়া উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটে গ্যাস বেরিয়ে, আগুন লেগে, জল ঢুকে পড়ে, দমকা হাওয়ার ফলে, বিস্ফোরক বিয়ে কয়লা ভাঙার সময়, খনির নীচে নামার সময় লিফটের দড়ি ছিঁড়ে বা কয়লা বয়ে আনার জন্যে পাতা রেল লাইনে।

প্রতি শিফটে একটা করে দল, বাকি শ্রমিকরা নামার আগেই খনিতে প্রবেশ করে। এরা সেফটি ল্যাম্প, মিথেনোমিটার বা মুনিয়া পাখি দিয়ে প্রথমে পরখ করে দেখে কোনো ক্ষতিকর গ্যাস বেরোচ্ছে কিনা। পাশাপাশি এরা দেখে নেয় সুইচগুলো, আপৎকালীন ঘন্টা, রেল লাইন, ছাদে লাগানো ঠেকনাগুলো

বন্ধ করে দেওয়া বিভিন্ন সুড়ঙ্গের দেওয়ালগুলো ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা। এরপর শুরু হয় 'কয়লা তৈরির পদ্ধতি'। এর জন্যে সুড়ঙ্গের যে অংশের দেওয়াল বা ছাদের কয়লা নেওয়া হবে সেই অংশে চুণজল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ড্রিল দিয়ে গর্ত শুঁড়ে তাতে প্রয়োজন মতো বিস্ফোরক ভরে দেওয়া হয়। সেই জায়গা থেকে অন্ততঃ ২৫ ফুট দূরে সরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এরপর আবার চুণজল ও শুদ্ধ জল স্প্রে করার পালা। এরপর গাইতি শাবল নিয়ে ড্রেসাররা দেওয়াল ও ছাদ থেকে ঝুলন্ত বা নড়বড়ে সব কয়লার চাঁই বা টুকরো ফেলে দেবার কাজ করে। কাঠের ঠেকনা লাগানো হয় তারপর, যাতে ছাদের থেকে কোনো কয়লা খসে না পড়ে। শেষে ট্রলির লাইন পাতার কাজ হয়ে গেলে বাকি শ্রমিকরা কয়লা বয়ে নিয়ে যেতে ভেতরে ঢোকে। নানান ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে আগে এ ধরণের সমস্ত কাজ করা হত নিয়ম মেনেই।

সুরক্ষা বা নিরাপত্তার ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দেবার কথা আজ প্রায় কেউই আর তেমনটা দেয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা নীতিস্বীকার করে উৎপাদনের কাছে। পিস-রেটেড শ্রমিকদের তর সয়না, তারা যতটা কয়লা তুলে রেল লাইনের ওপরে থাকা টবগুলোকে ভরতে পারবে তত তাদের মজুরী বেশী। কর্তৃপক্ষের তরফেও এ ব্যাপারে লোক দেখানো ফাঁকা বুলি ছাড়া সত্যিকারের উদ্যোগ কমই। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও সব সময়ই কম থাকে। এটা আরো বোঝা যায় যখন নানান পদের তুলনায় জেনারেল ম্যানেজার সেফটি পার্টি না পারতে কেউ নেন না যদিও এর গুরুত্ব অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে কম হবার কথা নয়। তাছাড়া দুর্ঘটনা ঘটলে, যার গাফিলতির জন্যে তা ঘটলো, তার শাস্তি আইনে থাকলেও তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না। বড় জোর বদলি করে দেওয়া হয়। নানান দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্তের ফলাফল বছরের পর বছর ঘুরে গেলেও প্রকাশ করাই হয় না। নিয়ম অনুযায়ী কোনো দুর্ঘটনাতে পাঁচ জনের বেশী মৃত্যু হলে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে তদন্তের জন্যে কোর্ট বসানো হয়। না হলে খনি সুরক্ষা দপ্তরই এর তদন্ত করে। আইন মতো চললে (অনেকের মতে) ৩০-৪০% খনি কাজ করার অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবে—আর সেগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রতিটা কোলিয়ারীতে একটা করে সেফটি বা নিরাপত্তা কমিটি আছে যাদের কাজ হল দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া। এই কমিটিগুলোতে থাকে কোলিয়ারী ম্যানেজার, ই সি এল-এর একজন সেফটি

অফিসার, সর্দারেরা, শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি ও একজন করে সরকারি সংস্থা ডাইরেক্টর জেনারেল মাইন সেফটি (ডি জি এম এস)-এর প্রতিনিধি। কার্যত দেখা যায় যে এই কমিটিগুলো মাঝে মাঝে বসে চা খাওয়া ছাড়া খুব কিছু কাজের কাজ করে না। জাতীয়করণের আগে ডি জি এম এস-এর মাইন বা খনি ইন্সপেক্টরদের, শ্রমিক থেকে ম্যানেজার সকলেই ভয় করত। কিন্তু জাতীয়করণের পরে ডি জি এম এস-এর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোও খুব কিছু গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয়নি। একমাত্র যখন কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ের খবর সংবাদপত্রের পাতায় হৈ চৈ ফেলে, তখন দৈনন্দিন অন্যান্য কাজ ফেলে সকলে এ ব্যাপারে চিন্তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। এক বয়স্ক ট্রেড ইউনিয়ন নেতার মতে—"দেখুন, যা ব্যবস্থা আছে সেটাকে যদি ই সি এল ঠিক মতন চালাত তাহলে কিন্তু অনেক দুর্ঘটনাই এড়ানো যেত। ঠিক যেমন শ্রমিক কল্যাণের নামে দেখা যায় প্রশাসনিক অপদার্থতা, ব্যবস্থাকে ঠিক মতো ব্যবহার করার চূড়ান্ত অদক্ষতা—এই ক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম। সত্যি কথা বলতে কি শ্রমিক থেকে ম্যানেজার, শ্রমিক সংগঠন থেকে ডি জি এম এস, যদি একে অপরকে শুধু দোষারোপ না করে, নিজেদের কাজটুকুই করে তাহলেও কিন্তু অনেকটাই কাজ হয়। তবু বলব এ ব্যাপারে ই সি এল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বেশী চোখে পড়ছে—এভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন খনি দুর্ঘটনার হার ভয়ানক বেড়ে যাবে।"

ভারতের সমস্ত কয়লা খনিতে দেখা যাচ্ছে '৯০ সালে ২০২ জন, '৯১তে ১৮৮ ও '৯২তে ২১২জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনার জন্য।

অন্য এক সূত্রের হিসেব অনুযায়ী ই সি এল-এ শুধু '৯৩ সালে ১২৯টা দুর্ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে যার ২৬টাতে শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটেছে।

পেশাগত রোগ ও অন্যান্য অসুস্থতা

কয়লা খনিতে কাজ করেন এমন শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে এটা পরিষ্কার হয় যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সাধারণভাবে খুবই খারাপ। দশ বারো বছর একটানা কাজ করার পর থেকেই নানান সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে।

ওদের ভাষায় 'ছাতির' অসুখ, মানে ফুসফুসের রোগ, অনেক শ্রমিকেরই আছে। এর প্রধান কারণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কয়লার গুঁড়ো নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে চলে যাওয়া।

কোমর ও পিঠের ব্যথার অভিযোগ বড় সংখ্যক শ্রমিকেরই। এর প্রধান কারণ অবৈজ্ঞানিকভাবে ওজন নেওয়া বা কয়লা ভাঙার কাজ করা, যা তাঁরা বছরের পর বছর করে চলেছেন।

এছাড়া আছে 'ভেরিকোস ভেন' নামক এক অসুখ। এ রোগে পায়ের দিকে রক্ত চলাচলের শিরাগুলো মোটা দড়ির মতন হয়ে যায় আর তার সঙ্গে শুরু হয় যন্ত্রনা। এ ধরণের রোগ হয় তাঁদেরই যাঁরা একটানা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভারি কাজ করেন।

এছাড়া আছে টি বি, পেটের অসুখ জাতীয় রোগ যা এখানকার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য আরো ভেঙে দেয়।

অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে কাজ করার পাশাপাশি এদের থাকার জায়গাও খুবই স্যাঁতস্যাঁতে ও নোংরা। কোয়ার্টারের আশেপাশে জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় মশার প্রকোপ খুব বেশী। ফলে ইদানিং ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া খুব বেড়ে গেছে।

শ্রমিকদের মধ্যে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় শিক্ষার হার খুব কম হওয়ায় 'খনিতে কাজ করলে মদ খেতেই হবে' ধরনের ধারণা খুব গভীর। ফলে প্রায় ৬০-৬৫% শ্রমিক মদ খান। এর সঙ্গে অপুষ্টি যোগ হওয়ায় খালি চোখেই ধরা পড়ে শ্রমিকদের ভেঙে যাওয়া স্বাস্থ্য।

দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলতার অভিযোগ

"কয়লা খনির অঞ্চল হল মাফিয়ার অঞ্চল। চুরি শব্দটা এখানে খাটেই না—সব ডাকাত। দিনে দুপুরে পুকুরচুরি হয়—আর এতে সবাই যুক্ত—ই সি এল কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক নেতা, নানান সংগঠন, পুলিশ ও শক্তিশালী সমাজবিরোধীরা। ই সি এল কর্তৃপক্ষের কাজে না আছে সমন্বয় না আছে কৈফিয়ৎ দেবার দায়—সব কিছু চলছে ভুল পরিকল্পনা, চরম বিশৃঙ্খলা ও চূড়ান্ত অরাজকতার মধ্যে দিয়ে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে যারা যেভাবে পারছে। এই পরিবেশে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি কি সম্ভব ?" বললেন সেই বয়স্ক শ্রমিক নেতা।

যাঁদের সঙ্গেই কথা হয়েছে দুর্নীতির ও বিশৃঙ্খলার মূল জায়গাগুলো সম্পর্কে তাঁরা একমত সকলেই। এ ব্যাপারে কথা বলা হয়েছিল ওই অঞ্চলের কয়েকটা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, সাধারণ শ্রমিক ও কিছু গণসংগঠনের

প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এই কথাবার্তা থেকে বেড়িয়ে আসা দুর্নীতির মূল জায়গাগুলো নীচে দেওয়া হল ঃ

□ এই অঞ্চলের এক বিরাট 'কালো ব্যবসা'—কয়লা চুরি। রাজনৈতিক নেতা ও রেল পুলিশের যোগসাজসে রেলের সাইডিং বা রেলপথ থেকেও ওয়াগন ভেঙে প্রচুর পরিমাণে কয়লা চুরি হয়। কতটা করে কয়লা চুরি হয় সেটা বোঝা যায় কিছুদিন আগেকার এক মিটিং-এর বিষয়বস্তু থেকে। মিটিংটা হয়েছিল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও ই সি এল-এর কর্তৃপক্ষের মধ্যে। পর্ষদ-এর বক্তব্য ছিল যতটা কয়লা শেষমেষ তারা পাচ্ছে ততটার দাম ই সি এল-কে দেওয়া হবে। অন্যদিকে ই সি এল-এর বক্তব্য যে যতটা তারা ওয়াগান বোঝাই করছে ততটার দামই তাদের প্রাপ্য। অর্থাৎ অল্পস্বল্প চুরি হলে তা নিয়ে নিশ্চয়ই মিটিং করতে হত না! হিসেব দেওয়া শক্ত, তবে লোকে বলে বছরে দশ বিশ কোটি টাকার এই ব্যবসা চলছে বেশ রমরমাই।

এছাড়া লাইসেন্স-প্রাপ্ত অনেকেই ডোলভারী অর্ডারের বিনিময়ে ট্রাকে করে কোলিয়ারী থেকে কয়লা তোলে। সেখানেও দু গাড়ির জায়গায় তিন গাড়ি বেরোনোটাই রেওয়াজ। কিছু খুচরো কয়লাও চুরি হয় এবং পরে তা বস্তাবন্দী অবস্থায় ট্রেনের কামরাগুলোতে পাচার হতে দেখা যায়। জ্বালানী হিসেবে সমস্ত শ্রমিকদের কিছুটা করে কয়লা পাবার কথা। সেই কয়লা মাসের শেষে গরুর গাড়ীতে করে অনেকেই নিয়ে যান হিসেবের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে। কিন্তু এভাবে যায় মোট চুরি হওয়া কয়লার খুব অল্প অংশই।

এছাড়া আর এক ধরণের কয়লা চুরি হয় পুরোনো বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত কয়লাখনি থেকে। সংগঠিত ভাবে এই খনিগুলো থেকে কয়লা তোলার কাজ চলে খুবই বিপজ্জনক ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে কিন্তু চোরা পথে। এর ফলে অনেক সময়েই ধস দেখা দেয় আশপাশের জমি বা বসতি অঞ্চলে। মিঠানী অঞ্চলে কিছুদিন আগে ধসের কারণ এই বেআইনী কয়লা তোলা।

□ দামোদর ও অজয় নদী থেকে বালি তুলে সেগুলো বিভিন্ন কোলিয়ারীতে পাঠানো হয়। এই বালি দিয়ে কয়লা তোলা হয়ে গেছে এমন পুরোনো সুড়ঙ্গগুলোকে ভরে দেওয়ার কথা যাতে ওপরের অংশ ধসে না যায়। এই বালিও হিসেব মতো ঠিক জায়গায় পৌঁছোয় না। চোরাপথে চালান হয়ে যায় হাওড়া, হুগলী, নদীয়া জেলায়।

ফলে সুড়ঙ্গগুলোতে যতটা বালি ভর্তি করার দরকার ততটা ভরা হয় না, আর এরজন্যই নানা জায়গায় মাটির ওপর দেখা দেয় ধস। এ ধরণের চুরির ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু শক্তিশালী ট্রাক মালিকও।

☐ বিভিন্ন কোলিয়ারীর স্টোর থেকে মালপত্তর পাচার হয়ে যায় বাজারের দোকানগুলোতে, পরে স্টোরে মাল না থাকায় নিয়ম অনুযায়ী খনির কাজ চালানোর জন্যে খোলা বাজার থেকেই কোলিয়ারীগুলো মাল কেনে। ফলে নিজেদের স্টোর থেকে চুরি যাওয়া মাল নিজেদেরই দ্বিতীয়বার কিনতে হয় ই সি এল-কে বাজারের দোকান থেকে।

☐ কোনো এক কোলিয়ারীতে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে এক দামী মেশিন বসানোর পর দেখা যায় যে সেখানে সেই মেশিনের আর কোনো প্রয়োজনই নেই। তখন আবার প্রচুর সময় ও টাকা নষ্ট করে সেই মেশিন অন্য জায়গায় বসানোর ব্যবস্থা হয়। মধ্যে থাকা ঠিকাদাররা এর ফলে কয়েক লাখ টাকা পেয়ে যায়।

☐ অভিজ্ঞ শ্রমিকদের মতে বেশ কয়েকটা কোলিয়ারীতেই পুঁজি কম লগ্নী করে তাড়াতাড়ি উৎপাদন করার তাগিদে ওপরের দিকে কয়লা তুলে কয়েকটা সুড়ঙ্গ বা কোনো সময় কোলিয়ারীই বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ফলে গভীরে থাকা অনেকটা কয়লাই নষ্ট হচ্ছে। পরে এই কয়লা তোলার জন্যে এখনকার তুলনায় খরচ করতে হবে কয়েকগুণ বেশী টাকা। নিজেদের ভবিষ্যত পদোন্নতির দিকে তাকিয়ে অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার মিথ্যে রিপোর্ট পেশ করে এ ধরনের কাজ করছে।

☐ কর্তৃপক্ষের ভিতর চলে চূড়ান্ত রাজনীতি। উচ্চপদস্থ অফিসারের আদেশ অমান্য করাটাই রেওয়াজ হয়ে গেছে। অফিসাররা যে যার মতো কাজ করেন। না আছে সমন্বয়, না আছে শৃঙ্খলা। ফলে পরিকল্পনা মাফিক কাজও হয়না, বহু জরুরী দিকে কারো নজরও থাকে না। এই অবস্থায় কাজের পরিবেশ যায় নষ্ট হয়ে, আর তার কুপ্রভাব পড়ে শ্রমিকদের ওপরেও।

- অনেক খনিতেই ই সি এল-এর কেনা দামী যন্ত্রপাতি জলে ডুবে নষ্ট হচ্ছে। ৫০ কোটি টাকার দুটো জেনারেটিং ইউনিট পড়ে আছে স্পেয়ারের অভাবে। এই মেশিন চালানোর জন্যে কর্মীদের বিদেশে পাঠানো হয়েছিল প্রশিক্ষণ নিতে। যে কোম্পানিতে এই মেশিন তৈরি হয়েছিল তারা বহুদিনই আর সেই মেশিন তৈরি করছে না।

- নানান মেশিন যা সহজেই ই সি এল-এর ওয়ার্কশপে সারানো যেত তা বাইরের প্রাইভেট কোম্পানিদের দিয়ে সারানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে ই সি এল-এর ওয়ার্কশপে তেমন চাপ না থাকলেও কাজ বাইরের থেকেই করিয়ে আনা হচ্ছে। পাশাপাশি এমন অনেক যন্ত্র বিদেশী কোম্পানি থেকে কেনা হচ্ছে যা আমাদের দেশেই তৈরী হয় ও বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হয়।

আলোচনা

হিসেবের খাতা অনুযায়ী এটা খুব স্পষ্ট যে একদিকে যেমন কোল ইণ্ডিয়া লাভজনক সংস্থা হয়ে উঠেছে অন্যদিকে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্-এর লোকসান বেড়েই চলেছে। শুধু কয়েকশ' কোটি টাকা গত বছর লোকসান হয়েছে এটুকু বলাটাই ই সি এল-এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। রোগ আসলে অনেক গভীরে। যে শিল্পে উৎপাদন খরচের ৫২% যায় মাইনে ও মজুরিতে ; যে শিল্পে টন প্রতি বাজার দর উৎপাদন খরচের ২৩% কম ; যে শিল্পে কয়েকশ' কোটি টাকার উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আনা সত্ত্বেও গত ১৮ বছরে উৎপাদন হেরফের একই থেকে যায় ; যে শিল্পে গরহাজিরার হার ৩০ থেকে ৪৪% ; যে শিল্পে ১৮ বছরে মোট লোকসান ২৬৬০·২৪ কোটি টাকা আর রাজ্য সরকারগুলোর কাছে বকেয়া পাওনা ৩,০০০ কোটি টাকা—সেই শিল্প রোগগ্রস্থ তো হবেই !

ই সি এল কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে এটা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে অতীতে একচেটিয়া অধিকার, উন্নত প্রযুক্তি, সরকারের উদার সাহায্য বা কয়লার অপর্যাপ্ত ভাণ্ডারের সুবিধে তখনকার কর্তৃপক্ষ নিতে পারেননি। ঠিক মতন পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করলে, বিশাল শ্রমশক্তিকে ঠিক মতন কাজে লাগিয়ে কাজের এক সুস্থ পরিবেশ ও সংস্কৃতি তৈরি করে, উৎপাদন বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে বাড়িয়ে ই সি এল ভবিষ্যতে শিল্পে বিনিয়োগের জন্যে খুব সহজেই এক উদ্বৃত্ত অর্থ ভান্ডার গড়ে তুলতে পারত।

কর্তৃপক্ষ আজ স্বীকার করছে যে ভারত সরকারের নয়া অর্থ ও শিল্প-নীতি আজ ই সি এল-কে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। সরকারি ভরতুকি একদিকে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, অন্যদিকে হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ও বেসরকারিকরণের চাপের মুখে ই সি এল কর্তৃপক্ষ যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কয়লা আমদানীর শুল্ক ৮৫% থেকে কমিয়ে ৩৫% করে দেবার ফলে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া-জাতীয় দেশ থেকে জাহাজে করে কয়লা আনানো অনেক সস্তা হয়ে গেছে। ফলে এ বছর সি আই এল-এর ৫০০ কোটি টাকা লোকসান হতে পারে। ৮৫% থাকাকালীনও তামিলনাড়ু সরকার আমদানী শুল্ক দিয়ে একবার বিদেশের কয়লা আনার চেষ্টা করেছিল। কর্তৃপক্ষের মতে ই সি এল-এর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন কারণ উৎপাদন খরচ বেশী; কয়লার মান নিয়ে অভিযোগ আসছে; প্রয়োজনের তুলনায় বেশী শ্রমশক্তিকে ঠিক মতন ব্যবহার করা হচ্ছে না; যন্ত্রপাতি ঠিক মতন পাওয়া যাচ্ছে না বা পেলেও ব্যবহার করা হচ্ছে না; প্রচুর অর্থ নষ্ট হচ্ছে বাজে খরচে, অত্যধিক সুদ দিয়ে বা ক্ষয়-ক্ষতির কারণে এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজের উৎসাহ কারোর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে না।—বিচার করে দেখলে এ সবের জন্যেই সব চাইতে বেশী দোষ ই সি এল কর্তৃপক্ষেরই!

ই সি এল কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী উদ্যোগের অভাব, ভ্রান্ত নীতি, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে অদক্ষতা, ভারসাম্যহীন পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব, দুর্নীতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেওয়ার যে ধারা সেটাই বেশী মাত্রায় দায়ী আজকের এই অবস্থার জন্যে। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়ঃ

- ই সি এল কর্তৃপক্ষ আজ বলছে যে জাতীয়করণের সময়কার চাপের ফলে প্রয়োজনের থেকে বেশী শ্রমিক নিতে হয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন করা যায়, এঁদের সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর জন্যে কেন নতুন খনি তৈরির কাজে আরো বেশী করে হাত দেওয়া হয়নি? '৯০ সালের আগে পর্যন্ত পুঁজি বিনিয়োগের কোনো সমস্যা ছিল না আর কয়লা তোলা হয়নি এমন 'আনকোরা' খনিরও যখন অভাব নেই। সেটা আরো স্পষ্ট হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে সারা দেশে ৪২টা খনি বেসরকারি সংস্থার

হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে যার অনেকগুলোই ই সি এল-এর আওতায় পড়ে। (উল্লেখ করা যায় যে গোয়েঙ্কাদের একটা খনি দেওয়া হয়েছে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন চালানোর জন্যে।) উদ্যোগ হীনতা ও ভ্রান্ত নীতির এ এক স্পষ্ট উদাহরণ।

● ই সি এল অন্যান্য কোম্পানিগুলোর তুলনায় কম কয়লা তোলে তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হল এই যে, এই অঞ্চলে কয়লার স্তর অনেক গভীর হওয়ার ফলে ই সি এল ও বি সি সি এল (ধানবাদ)-এ বেশীটাই হল আণ্ডারগ্রাউণ্ড (মাটির তলার) খনি। অন্যান্য অঞ্চলে অনেক কম খরচে, অনেক বেশী কয়লা, ওপেন কাস্ট খনিগুলো থেকে তোলা হয়। কিন্তু ই সি এল-এর মুগমা-সালানপুর অঞ্চলে ১১টা ওপেন কাস্ট খনির উৎপাদন খরচ অন্যান্য কোম্পানিগুলোর তুলনায় কেমন ? একই মানের, একই পদ্ধতিতে, একই প্রযুক্তির সাহায্যে কয়লা তুলতে, একই হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালনায় ই সি এল-এ উৎপাদন খরচ পড়ে ৫০০ টাকা প্রতি টন, যেখানে বি সি সি এল ও সি সি এল-এ এই খরচ ২০০ থেকে ২৫০ টাকা এবং এস ই সি এল, এম সি এল ও এন সি এল-এ এই খরচ ১৫০ থেকে ২০০ টাকা প্রতি টন। পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান অন্য কোম্পানিগুলোর মতন হলে এ অবস্থা আজ হত না।

● কিছু কিছু খনিতে বিদেশী সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। তার কয়েকটাতে প্রযুক্তি দিচ্ছে বিদেশী সংস্থা, টাকা দিচ্ছে কোল ইণ্ডিয়া, মেশিন তৈরি করছে বিদেশী খসড়া অনুযায়ী দেশী কোম্পানী। যেহেতু এ ভাবে 'অর্ডার' দিয়ে মেশিন তৈরি হচ্ছে অনেক স্পেয়ার পার্টসই পাওয়া শক্ত হয়ে যাচ্ছে। মেশিন পড়ে থাকছে অকেজো হয়ে। অন্য কয়েকটা ক্ষেত্রে ভুল জায়গায় ভুল মেশিন বসানোর ফলে কোটি কোটি টাকার খেসারৎ দিতে হচ্ছে ই সি এল-কে। অনেক মেশিন ক্রেট-বন্দী অবস্থাতেই প্রথম থেকে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে এও আকছার দেখা যাচ্ছে। আবার আরো কিছু ক্ষেত্রে খনির গভীরে কয়লা থেকে গেলেও ভুল পরিকল্পনার ফলে কয়লা আছে এমন খনিও আজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে ই সি এল—নষ্ট হচ্ছে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ফলে ই সি এল পরিকল্পনা করে না বললে ভুল হবে—আসলে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলোতে ভারসাম্যের বড় অভাব।

● কয়লা চুরি, বালি চুরি, স্টোর ইত্যাদি জায়গা থেকে চুরি বা ঠিকেদার সাপ্লায়ার চক্রের মুনাফা লোটা ছাড়াও যে মর্মান্তিক দুর্নীতির খবর সকলেই জানেন তা হল অসুস্থতার কারণে চাকরি ছেড়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে। নিয়ম অনুযায়ী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে মেডিক্যাল বোর্ড শ্রমিকদের 'আনফিট' করে। এমনটা হলে এর বদলে পরিবারের অন্য একজনের চাকরি চুক্তি অনুযায়ী বাঁধা। এই ধরণের সুবিধে পাবার জন্যে বর্তমানে 'অসুস্থ' শ্রমিকদের খরচা পড়ে ৪০ হাজার টাকা। এসব নানা ধরণের দুর্নীতি অবাধে চলতে দিলে তা যে শুধু আরো নতুন পথের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় তাই না, সমস্ত কাজের পরিবেশকেই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

* * * *

কেন ই সি এল কর্তৃপক্ষ সব কিছু এভাবেই চলতে দিচ্ছে সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো এক বিশেষ আশংকার কথা বলছে। তাদের মতে এভাবে চলতে দিয়ে ই সি এল-কে রুগ্ন করে তোলাটা একটা চালও হতে পারে। একদিকে 'আনকোরা' কিছু ওপেন কাস্ট খনি তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে ; আর অন্য দিকে আন্ডারগ্রাউন্ড খনিগুলোকে দেখানো হচ্ছে অ-লাভজনক হিসেবে। রুগ্নতার ধুয়ো তুলে কর্মী ছাঁটাই ও ভি আর এস করিয়ে, মাইনে কমিয়ে, কাজের বোঝা বাড়িয়ে, ভবিষ্যতে 'লাভজনক' অবস্থায় এগুলোও তুলে দেওয়া হবে হয়ত ব্যক্তি-মালিকদের হাতে। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা।

মজুরী সম্পর্কিত চুক্তি-জাতীয় অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো সফল ও শক্তিশালী। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, শিল্পে উৎপাদন খরচ, দুর্নীতি ইত্যাদি বা শ্রমিকদের অন্যান্য প্রাপ্য অধিকারগুলোর ব্যাপারেও তেমন ব্যাপক চাপ সৃষ্টি বা জনমত গঠনের তেমন কোনো লক্ষণ চোখে পড়ল না।

একটা বিষয় সচেতনতার অভাব খুব আশ্চর্য্য করল। তা হল নিউমোকোনিওসিস রোগ সম্পর্কে। বেশীর ভাগ শ্রমিক নেতাও (যে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে) এই নামটির সঙ্গে এমনকি পরিচিতও নন। একজন প্রবীন ও খ্যাতনামা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অবশ্য বললেন যে গত মজুরী চুক্তির খসড়ায় এ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এ অঞ্চলে এ রোগ ধরার এখনও কোনো

ব্যবস্থাই নেই। যে রোগ 'খনি শ্রমিকের রোগ' হিসেবেই পরিচিত, যে ফুস-ফুসের রোগে অন্যান্য দেশেও ২০-২৫% শ্রমিক আক্রান্ত হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েন —সে রোগ সম্পর্কে এধরণের অস্পষ্টতা খুব অবাক করল।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো বর্তমানে একটা খুব জোরালো আন্দোলনে নেমেছে—তা হল কয়লা শিল্পের শ্রমিকদের পেনসন স্কীম চালু করার স্বপক্ষে।

* * *

শ্রমিকদের কাছ থেকে শোনা তাঁদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের বিশ্লেষণ সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়ঃ

- ☐ জাতীয়করণের পরে শ্রমিকদের অবস্থা একটা ব্যাপারে অনেক ভাল। কারণ তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা অনেকটাই বেড়েছে—জীবন ও কাজের গ্যারান্টি এসেছে—নিজেদের ভবিষ্যৎ আজ আগের তুলনায় তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।
- ☐ মাইনে অনেক বাড়লেও খরচ করার জায়গাও বেড়ে গেছে।
- ☐ আগের তুলনায় তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ মোটেই বাড়েনি—যাঁরা পয়সা খরচ করতে পারেন তাঁদের জন্যে অনেক বেশী দামী স্কুল হয়েছে।
- ☐ থাকার ঘরগুলোর অবস্থা খারাপ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও তাই।
- ☐ আগে শ্রমিকরা রেশন পেতেন, এখন পান না।
- ☐ অন্য শিল্পের তুলনায় শ্রমিকদের শিক্ষার হার বেশ নীচু—ফলে ইউনিয়ন নেতাদের ওপর খুবই নির্ভর করতে হয়। কখনও দরখাস্ত লেখা বা ফর্ম ভরে দেবার জন্যে পয়সাও লাগে।
- ☐ খনির মধ্যে সুরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে জাতীয়করণের আগে অবস্থা অনেক ভালো ছিল, দুর্নীতিও অনেক কম ছিল।

* * *

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে এই মুহূর্তে এত বিশাল ও জটিল কয়লা শিল্প সম্পর্কে খুব জোর দিয়ে শেষ কথা বলার মতো ক'রে কিছু বলা অনুচিৎ—সম্ভবও নয়। তবু কিছু প্রাথমিক মতামত এই সমীক্ষা থেকে উঠে আসায় তা আমরা আলোচনার জন্যেই রাখছি।

ই সি এল পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা চূড়ান্ত ভাবে ধরা পড়ে। যে যে লক্ষ্য নিয়ে জাতীয়করণ করা হয়েছিল কয়লা শিল্পকে তা ই সি এল-এর ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে—এটা বললে ভুল হবে না। নাগরিক মঞ্চের দৃষ্টিকোণ থেকে কয়লা শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি না হলেও কোনো লক্ষণীয় উন্নতি যে হয়নি তা জোর দিয়েই বলা যায়। শিল্পকে চেনা ও চেনানোর ক্ষেত্রে, শিল্পের স্বাস্থ্যের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে সংযুক্ত করার কাজে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো তেমন কোনো চোখে পড়ার মতন দৃঢ় পদক্ষেপ এখনও নেয়নি বলেই মনে হয়েছে। শিল্পের ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ানো যে আখেরে শ্রমিক স্বার্থই ক্ষুন্ন হবে সে ব্যাপারে জোরের থেকে, বেশি জোর চোখে পড়েছে কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করার ব্যাপারেই।

একথা বলার মানে কিন্তু আদপেও এমনটা নয় যে ই সি এল-এর এই সংকটের জন্যে সকলেই সমান ভাবে দায়ী। দায়িত্ব মূলতঃ সরকার, তার নীতি ও ই সি এল কর্তৃপক্ষের। অনেক অসুবিধে থাকলেও এটা মেনে নেওয়া যায় না যে কোল ইন্ডিয়ার আওতার অন্যান্য কোম্পানিগুলো লাভ করতে পারলে ই সি এল তা পারবে না। এবং তার বিকল্প কোনো মতেই হতে পারে না বেসরকারি সংস্থার হাতে কয়লা খনি তুলে দেওয়া।

তথ্যসূত্র ঃ

১. কোল ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউ ঃ ডাইরেক্টরেট অফ পারসোনেল, সি আই এল (জুলাই '৯৩)।

২. কোল ডায়রি ঃ সি আই এল ('৯৪)।

৩. অ্যাপ্রোচ পেপার ফর ইন্টারফেস ওয়ার্কশপ অন ওয়েজ নেগোশিয়েশন ইন কোল ইন্ডাস্ট্রী ঃ সি আই এল (জুলাই '৯৩)।

৪. প্রোডাক্টিভিটি লিংকড বোনাস স্কীম ঃ সি আই এল (জুলাই '৯৩)।